International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-III, May 2023, Page No.40-46
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.40-46

সাংখ্যদর্শনে সৃষ্টি সম্পর্কে: একটি যুক্তিভিত্তিক আলোচনা

বিশ্বজিৎ রায়
এম. ফিল, দর্শন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কলেজ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

Abstract:
Creation is a very peculiar mystery. Every human being appears in the world, many questions arise in their minds about creation. The arising questions like that, what is the creation? What is the main cause of the creation? Who is the creator of the world? From the beginning of creation, people have been seeking answers to those questions; it will be on further. It can be said that as human civilization has developed, the desire to know the secret of creation has intensified. Even in the future, the desire to know the secret of the creation will become sharp. Creation can be explained from different perspectives in Indian philosophy. But this article explains creation from the perspective of Sāṁkhya philosophy. This Sāṁkhya philosophy is dualistic because this philosophy admitted two principles as Prakṛti and Puruṣa. In this philosophy, creation is explained only through Prakṛti. But creation cannot be arisen from Prakṛti alone, because Prakṛti is unconscious. So they need something else for creation except Prakṛti. This something else is Puruṣa that is conscious. What is the role of Puruṣa in the creation of Sāṁkhya philosophy? I tried to seek an answer to that question in this article.
Keywords: Sṛṣṭi, Prakṛti, Puruṣa, Guṇas, Avyakta, Draṣṭā.

সাংখ্যদর্শন হল এক দ্বৈতবাদী দর্শন। কেননা এই দর্শনে দুটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে—‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’। প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টির মূলকারণ। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যাকারিকা গ্রন্থে প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন—“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি”[1] । অর্থাৎ প্রকৃতি অবিকৃতি, প্রকৃতির কোনো কারণ নেই। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁর সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী টীকা গ্রন্থে প্রকৃতির ব্যাখ্যায় বলেছেন—“প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানম্ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা”[2] । অর্থাৎ যা প্রকৃষ্ট কারণ তাই প্রকৃতি। প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম◌্যাবস্থা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা অতিরিক্তভাবে প্রকৃতি বলে কিছু নেই।

অন্যদিকে সাংখ্যদর্শনের অপর তত্ত্ব হল পুরুষ। পুরুষের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যাকারিকা গ্রন্থে বলেছেন—“ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ”[3] । অর্থাৎ পুরুষ কোনো কিছুর কারণও নয় আবার কার্যও নয়। অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি থেকে ভিন্ন এক তত্ত্ব।

সৃষ্টি সম্পর্কে সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে যে, জগৎ ও জগতের সব কিছুই প্রকৃতির পরিণাম। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রকৃতির পরিণাম কত প্রকার ও কী কী? এই ক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতির যে পরিণাম তা দু'প্রকার—স্বরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। কিন্তু প্রকৃতির এই দু'প্রকার পরিণাম কখন ঘটে? এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিহীন অবস্থা ও প্রলয়কালে প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম ঘটে। কেননা এই ক্ষেত্রে কোনো কিছুর সৃষ্টি হয় না, কেবলমাত্র গুণত্রয় নিজের মধ্যে পরিণামপ্রাপ্ত হতে থাকে, সত্ত্বগুণ সত্ত্বে, রজঃগুণ রজে ও তমঃগুণ তমে পরিণামপ্রাপ্ত হয়—"প্রতিসর্গাবস্থায়াং সত্ত্বং রজস্তমশ্চ সদৃশপরিণামানি ভবন্তি। পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাহপরিণময্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া, রজো রজোরূপতয়া, তমস্তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ততে"[4]।

কিন্তু সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রয়োজন বিরূপ পরিণাম, যেখানে ত্রিগুণের মধ্যে বৈষম্যের সঞ্চার হয়। এখন প্রশ্ন হল যে, ত্রিগুণের মধ্যে বৈষম্যের সঞ্চার কীভাবে সম্ভব? কেননা প্রকৃতি জড় হওয়ায় যন্ত্রের ন্যায় তার স্বরূপ পরিণাম চলতে থাকে, কখনো গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্যের সঞ্চার হবে না। এই কারণে সাংখ্যদর্শনে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করার জন্য পুরুষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে—

"তস্মাত্তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিবলিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ।।"[5]

কিন্তু প্রকৃতির সাম্যাবস্থার মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করার জন্য পুরুষের সান্নিধ্যতা স্বীকার করলেই হবে না। কেননা পুরুষের সান্নিধ্যতা স্বীকার করার ফলে সমস্যার উদয় হয়। যে সমস্যাটি উঠে আসে তা হল—প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সান্নিধ্যতামূলক যে সম্বন্ধ তা আসলে কী ধরনের সম্বন্ধ নিত্য না অনিত্য? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সাংখ্যাচার্যদের কাছে নেই। কেননা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ নিত্য হলে সর্বদা সৃষ্টিই হতে থাকবে, বিনাশ কখনো সম্ভব হবে না। আবার প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে সান্নিধ্যতামূলক সম্বন্ধ তাকে আকস্মিক বা অনিত্য সম্বন্ধও বলা যায় না। কেননা নিত্য ও বিভু পদার্থের মধ্যে কখনো আকস্মিক সম্বন্ধ হতে পারে না। এই জন্য প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্বন্ধকে নিত্য ও অনিত্য কোন কিছুই বলা যায় না। প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে সান্নিধ্যতার সম্বন্ধ তা ব্যাখ্যার জন্য সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ অনেকটা অন্ধ ও পঙ্গুর ব্যক্তির সম্বন্ধের অনুরূপ। যেমন একজন অন্ধ ব্যক্তির দর্শন শক্তি নেই, কিন্তু তার চলন ক্ষমতা আছে। অন্যদিকে পঙ্গু ব্যক্তির দর্শন শক্তি আছে, কিন্তু তার চলন ক্ষমতা নেই। এখন অন্ধ ও পঙ্গু ব্যক্তি যদি উভয়েই একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে তাহলে তাদের উভয়কে পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কেননা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত কখনোই তারা পৃথকভাবে নিদিষ্ট গন্তব্যে পৌঁচ্ছতে সক্ষম হবে না। ঠিক একই রকম ভাবে সৃষ্টির বাখ্যাই করা যাবে না, প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্যতা ব্যতীত। তাই প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্যতার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য সাংখ্যাচার্যগণ যে উত্তর প্রদান করেন তা হল 'প্রয়োজন'। এই প্রয়োজন হল পুরুষের 'কৈবল্য' ও প্রকৃতির 'ভোগ'। প্রকৃতি ও পুরুষের যে নিজস্ব প্রয়োজন তা কখনো পরস্পর নিরপেক্ষভাবে সাধন করা সম্ভব নয়। এই কারণে উভয়ের প্রয়োজন স্বার্থক হবে যদি প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় উভয়কে পরস্পরের উপকারসাধক হিসেবে বিবেচনা করে—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।।"[6]

সান্নিধ্যতার কারণ হিসেবে সাংখ্যাদর্শনে যে পরস্পর পরস্পরের উপকারসাধনরূপ যে প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে তা যথার্থ নয়। প্রকৃতি অচেতন হওয়ার জন্য তার নিজস্ব কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। কেননা যা অচেতন তার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। তেমনি অন্যদিকে আবার পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত হওয়ার জন্য তার কৈবল্যও সম্ভব নয়। অর্থাৎ পুরুষেরও কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। কেননা যা নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত তার প্রকৃতির ন্যায় কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। তবে এই উপমা পঙ্গু ও অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথার্থ হলেও প্রকৃতি ও পুরুষের ক্ষেত্রে যথার্থ নয়। অর্থাৎ সাংখ্যাদর্শনে যে, লৌকিক উপমা পঙ্গু ও অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় যেভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্যতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তা যথার্থ নয়।

এখন প্রশ্নটি হল যে, স্বরূপ পরিণামের মধ্যে কীভাবে বৈষম্যের সঞ্চার সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন যে, প্রকৃতির স্বরূপ পরিমাণের মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করার জন্য পুরুষের সান্নিধ্যতার প্রয়োজন নেই। বরং পুরুষের সান্নিধ্যতা ব্যতীত প্রকৃতির স্বরূপ পরিণামের মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করা সম্ভব। এখন কীভাবে পুরুষের সান্নিধ্যতা ব্যতীত প্রকৃতির স্বরূপ পরিণামের মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করা সম্ভব হবে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লৌকিক উপমার সাহায্য নিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে সাংখ্যাচার্যগণ বলেছেন যে, অচেতন বস্তু প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। অচেতন বস্তুর স্বতঃ যে প্রবত্তি তা বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়—দুগ্ধের মধ্যে। কেননা দুগ্ধ অচেতন হওয়া সত্ত্বেও গাভীর স্তন্যে দুগ্ধ যেমন স্বতঃই বাছুরের বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষরণ হয়। ঠিক তেমনি ভাবে পুরুষের কৈবল্যের নিমিত্ত প্রকৃতির স্বরূপ পরিণামের মধ্যে স্বতঃই বৈষম্যের সঞ্চার হয়। অর্থাৎ স্বরূপ পরিণামে বৈষম্য সঞ্চার করার জন্য পুরুষের কোনো প্রয়োজন নেই—

“বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।।”[7]

এই ভাবে সাংখ্যাদর্শনে প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু কী করে একজন বিচারবান ব্যক্তি, প্রকৃতির স্বতঃ বিরূপ পরিণাম স্বীকার করতে পারে? কেননা প্রকৃতি জড় হওয়ার জন্য অনাদিকাল ধরে চলে আসা প্রকৃতির স্বরূপ পরিণামের মধ্যে হঠাৎ স্বতঃ বৈষম্য কখনো সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা প্রকৃতির স্বরূপ পরিণাম এক ধরনের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিশেষ। আর যান্ত্রিক প্রক্রিয়া কখনোই উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কার্য করতে পারে না। অর্থাৎ প্রকৃতি জড় হওয়ার জন্য তার কোনো উদ্দেশ্যমূলক কার্য করার ক্ষমতা নেই। অনাদিকাল ধরে চলে আসা, প্রকৃতির স্বরূপ পরিণামের মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করার জন্য অবশ্যই এক পরিকল্পনামূলক কর্তার প্রয়োজন। কেননা পরিকল্পনা ব্যতীত অনাদিকালের সাম্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করা কখনো সম্ভব নয়। আর বৈষম্য সঞ্চার করার জন্য যে পরিকল্পনামূলক শক্তি প্রয়োজন প্রকৃতির মধ্যে তা কখনোই থাকতে পারে না। কেননা এই শক্তির আশ্রয় প্রকৃতি অতিরিক্ত অন্য এক চেতন তত্ত্ব। সাংখ্যদর্শনে সেই চেতন তত্ত্ব হল পুরুষ।

তবে সাংখ্যাদর্শনে চেতন তত্ত্ব ‘পুরুষ’ বলতে আসলে কোন পুরুষকে বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্টভাবে অলোচনা করা হয়নি। তাই ‘পুরুষ’ শব্দটিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কেননা ‘পুরুষ’ শব্দটি অনেক পুরুষের নির্দেশক হয়। ‘পুরুষ’ শব্দটিকে বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, ‘পুরুষ’ বলতে অনেক পুরুষকে বোঝানো হয়ে থাকে। যথা—পরম পুরুষ, নিত্য-মুক্ত পুরুষ, মুক্ত পুরুষ ও বদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ‘পুরুষ’ বলতে কোন নিদিষ্ট পুরুষকে ইঙ্গিত না করলেও এই দর্শনে এক ধরনের পুরুষকে

গভীর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেই পুরুষ হল বদ্ধ বা সংসারী পুরুষ, যা সংখ্যায় অনেক। বদ্ধ বা সংসারী পুরুষকে দর্শনে 'জীবাত্মা' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বদ্ধ বা সংসারী পুরুষের দ্বারা কখনো সৃষ্টির সূচনা হতেই পারে না। কেননা বদ্ধ বা সংসারী পুরুষের দ্বারা প্রকৃতির বৈষম্য স্বীকার করলে সৃষ্টির যথার্থ ব্যাখ্যা হয় না। তাই সাংখ্যদর্শনে এমন এক পুরুষের উল্লেখ করতে হয়, যার দ্বারা সৃষ্টির সূচনা হতে পারে। সাংখ্যদর্শনে এমন এক পুরুষের উল্লেখ সুপ্তভাবে আছে, যার দ্বারা সাংখ্যদর্শনে স্বরূপ পরিণামের মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করার চেষ্টা করা হয়, যার ফলে সৃষ্টির সূচনা হতে পারে। সৃষ্টির সূচনা সাধক পুরুষকে এক 'বিশেষ পুরুষ' হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। কেননা এই বিশেষ পুরুষ ব্যতীত অন্য কোনো সংসারী পুরুষের দ্বারা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিশেষ পুরুষের সাহায্যেই কেন সৃষ্টির সূচনা হয়? বিশেষ পুরুষকে যদি স্বীকার করা না হয় তাহলে আমাদের কাছে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার দুটো দিক থাকে। আর দুটি দিকের একটিকে গ্রহণ করে সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। এই দুটি দিকের একটি হল—প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করা। অন্যটি হল—প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্যতামূলক যে সমন্ধ তা স্বীকার করা। কিন্তু উপরিক্ত আলোচনায় দেখিয়েছি যে, প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি এবং প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্যতামূলক যে সমন্ধ কোনোটিকেই স্বীকার করা যায় না। কেননা উভয় দিককে স্বীকার করলে যে সমস্যার উদয় হয় তার কোন যথার্থ সমাধান সাংখ্যাচার্যগণের কাছে নেই। তাই সৃষ্টির যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য আমাদেরকে এক বিকল্প পথের আশ্রয় নিতে হয়। সেই বিকল্প আশ্রয় পথ হল পুরুষের অন্তর্ভুক্ত এক 'বিশেষ পুরুষ'। আর এই বিশেষ পুরুষই, সৃষ্টির নিমিত্ত গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করেন। যার ফলস্বরূপ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন প্রথম তত্ত্ব হল 'মহৎ'। এই মহৎ হল বিশ্ব মহৎ, যা আবার 'মহান' ও 'বুদ্ধি' নামে অভিহিত। সব উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে মহৎ মহাপরিমাণযুক্ত, যা জগতের সব উৎপন্ন বস্তুরই বীজ। এমনকি 'আমার বুদ্ধি', 'তোমার বুদ্ধি', 'রামের বুদ্ধি' ও 'শ্যামের বুদ্ধি' এই সব কিছুই বিশ্ব মহৎ বা বুদ্ধির অন্তরর্গত। 'অধ্যবসায়' হল বুদ্ধির লক্ষণ। আর 'অধ্যবসায়' বলতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'এটি আমার কর্তব্য'—এরূপ নিশ্চয়ই হল 'অধ্যবসায়'। আর বুদ্ধিই পুরুষের ভোগ ও কৈবল্যের হেতু। তাই পুরুষের ভোগ ও কৈবল্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অবদান অপরিসীম। এই মহৎ বা বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনো কিছু পুরুষকে ভোগ ও কৈবল্য প্রদান করতে পারে না। কেননা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় যা কিছু গ্রহণ করে তা সর্বপ্রথমে মনকে প্রেরণ করে তারপর মন, অহংকারকে এবং অহংকার, বুদ্ধিকে প্রেরণ করে। পরিশেষে, বুদ্ধিই নির্ধারণ করে কোন বিষয়টি পুরুষকে প্রদান করার উপযোগী অথবা অনুপযোগী। আর বুদ্ধি যেমন পুরুষকে ভোগ প্রদান করে ঠিক তেমনি ভাবে বুদ্ধিই পুরুষকে কৈবল্য অর্থাৎ পুরুষ যে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন এই জ্ঞান প্রদান করে।

বিশ্ব বুদ্ধির পরিণাম হল বিশ্ব অহংকার। ব্যক্তি বুদ্ধির ন্যায় 'এটা রামের বই', 'এটা শ্যামের বই', 'এটা আমার বই নয়'—এই ধরনের অহংকার বিশ্ব অহংকারের অন্তর্গত। আর অভিমানই হল অহংকার। 'আমি এই নাম বিশিষ্ট', 'এটা আমার দেহ'—এই জাতীয় অভিমানই অহংকার। আর অভিমান থেকেই অহংকারের আবির্ভাব হয়। এমনকি অহংকারের জন্যই ব্যক্তি জাগতিক বিষয়বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে কার্যে অগ্রসর হয়। অহংকার ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় ত্রিগুণের তারতম্য অনুসারে অহংকার তিন প্রকার—সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্য সাত্ত্বিক অহংকার, রজগুণের আধিক্য জন্য রাজসিক অহংকার ও তমগুণের আধিক্য জন্য তামসিক অহংকার ইত্যাদি। তবে অহংকার ত্রিগুণের তারতম্য জন্য তিন প্রকার হলেও রাজসিক অহংকার থেকে কোনো কিছুর

পরিণাম হয় না। কিন্তু রাজসিক অহংকারের জন্যই অন্যান্য দুটি অহংকারের পরিণাম হয়। কেননা রাজসিক অহংকারই কেবলমাত্র সক্রিয়, অন্য দুই প্রকার অহংকার নিষ্ক্রিয়। রাজসিক অহংকারের সক্রিয়তার জন্য সাত্ত্বিক অহংকার থেকে আবির্ভূত হয় একাদশ তত্ত্ব। এই একাদশ তত্ত্ব হল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন। অন্যদিকে তামসিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় পঞ্চতন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় পঞ্চমহাভূত।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হল যে, পঞ্চতন্মাত্র থেকে কীভাবে পঞ্চমহাভূতের উৎপন্ন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের মধ্যে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'সাংখ্যাতত্ত্বকৌমুদী' টীকা গ্রন্থে পঞ্চতন্মাত্র থেকে কীভাবে পঞ্চমহাভূতের উৎপন্ন হয় তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এই পাঁচটি তন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূতের উৎপন্ন হয় বললে বোঝা যায় যে, এক একটি তন্মাত্র হতে এক একটি মহাভূত উৎপন্ন হয়। কিন্তু এখানে ঐরূপ বোঝা যথার্থ নয়। যদিও এক একটি মহাভূতের উৎপত্তিতে এক একটি তন্মাত্র মুখ্য হয়, কিন্তু অন্য তন্মাত্র সহকারী হয়। কেবলমাত্র আকাশ নামক মহাভূতের উৎপত্তিতে অন্য তন্মাত্র সহকারী হয় না। অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র হতে কেবলমাত্র আকাশ উৎপন্ন হয়। আর আকাশ ব্যতীত সব মহাভূতের উৎপত্তি উপাদানকারণ ও সহকারীকারণের সমন্বয়ে হয়। তবে মহাভূত গুলির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে, মহাভূত গুলি যে উপাদানকারণ ও সহকারীকারণের সমন্বয়ে গঠিত তা বোঝা যায়, কোন মহাভূতটি কোন কোন তন্মাত্র দ্বারা উৎপন্ন হয় তার গুণের দ্বারা। যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই গুণ গুলির মধ্যে আকাশে কেবল শব্দের উপলব্ধি হয়। ফলে এতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আকাশ শব্দগুণাত্মক। আর উক্ত গুণ গুলির মধ্যে শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো গুণ আকাশে থাকে না। সুতরাং এটা স্বীকৃত যে, আকাশ কেবলমাত্র শব্দতন্মাত্র হতে উৎপন্ন। স্পর্শতন্মাত্র হতে বায়ুর উৎপন্ন হয়। তাই বায়ুর উৎপত্তিতে স্পর্শতন্মাত্র উপাদানকারণ। কিন্তু বায়ুর মধ্যে শব্দের উপলব্ধি হয়। এই জন্য শব্দতন্মাত্র বায়ু উৎপত্তিতে সহকারীকারণ। রূপতন্মাত্র হতে তেজের উৎপত্তি হয়। তাই তেজের উৎপত্তিতে রূপতন্মাত্র উপাদানকারণ। কিন্তু তেজের মধ্যে শব্দ ও স্পর্শের উপলব্ধি হয়। এই কারণে শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র তেজের উৎপত্তিতে সহকারীকারণ। রসতন্মাত্র হতে জলের উৎপত্তি হয়। তাই জল উৎপত্তিতে রসতন্মাত্র উপাদানকারণ। কিন্তু জলের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ইত্যাদির উপলব্ধি হয়। এই কারণে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও রূপতন্মাত্র জলের উৎপত্তিতে সহকারীকারণ। গন্ধতন্মাত্র হতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। তাই গন্ধতন্মাত্র পৃথিবীর উৎপত্তিতে উপাদানকারণ। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ইত্যাদির উপলব্ধি হয়। এই কারণে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ও রসতন্মাত্র পৃথিবীর উৎপত্তিতে সহকারীকারণ।

অন্যদিকে যুক্তিদীপিকার, টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রক্রিয়াকে সামালোচনা করে বলেছেন যে, এক একটি মহাভূতের উৎপত্তিতে একটি তন্মাত্রই কারণ, অন্য কোনো সহকারীকারণের প্রয়োজন হয় না। যুক্তিদীপিকার বলেছেন যে, পঞ্চতন্মাত্র থেকে যে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি কীভাবে হয়—এই ব্যাখ্যাটিকে যদি একটু অন্যভাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তিতে সহকারীকারণ স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন হয় না। যুক্তিদীপিকারের মতে ব্যাখ্যাটি হল—শব্দগুণবিশিষ্ট শব্দতন্মাত্র হতে আকাশ, শব্দস্পর্শগুণবিশিষ্ট স্পর্শতন্মাত্র হতে বায়ু, শব্দস্পর্শরূপগুণবিশিষ্ট রূপতন্মাত্র হতে তেজ, শব্দ স্পর্শরূপরসগুণবিশিষ্ট রসতন্মাত্র হতে জল ও শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণবিশষ্ট গন্ধতন্মাত্র হতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। তবে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও এটা নিশ্চিত যে,

পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। আর এই পঞ্চমহাভূতের মাধ্যমেই জগৎ ও জগতের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি।

তাই পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সাংখ্যদর্শনে জগৎ সৃষ্টি যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই ভাবে অন্য কোনো দর্শনে জগৎ সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে এই দর্শনে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতি থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। আর পঞ্চমহাভূত থেকে জগৎ ও জগতের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়। জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে উপাদানকারণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে, নিমিত্তকারণ হিসাবে কোনো কিছু স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু নিমিত্তকারণ হিসেবে বিশেষ পুরুষকে স্বীকার না করলে ত্রিগুণের মধ্যে বৈষম্য সঞ্চার করা সম্ভব নয়। আর ত্রিগুণের মধ্যে বৈষম্য সঞ্চারিত না হলে জগৎ সৃষ্টির সূচনা হতে পারে না। তাই নিমিত্তকারণ হিসেবে বিশেষ পুরুষকে স্বীকার করতেই হবে। কেননা বিশেষ পুরুষ ব্যতীত জগৎ সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই কারণে বলা যায় যে, সাংখ্যদর্শনে সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ পুরুষের অবদান অপরিসীম।

তথ্যসূত্র:

১. ভাবঘনানন্দ, স্বামী সাংখ্যকারিকা, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, কারিকা সংখ্যা-৩, পৃ:৪
২. গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যাতত্ত্বকৌমুদী, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ:৩৬
৩. ভাবঘনানন্দ, স্বামী, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, কারিকা সংখ্যা-৩, পৃ:৪
৪. গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যাতত্ত্বকৌমুদী, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃ:১৬৪
৫. ভাবঘনানন্দ, স্বামী, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, কারিকা সংখ্যা-২০, পৃ:২৫
৬. ভাবঘনানন্দ, স্বামী, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, কারিকা সংখ্যা-২১, পৃ:২৬
৭. ভাবঘনানন্দ, স্বামী, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, কারিকা সংখ্যা-৫৭, পৃ: ৫৮

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আচার্য্য, ধ্রুব, সাংখ্যীয় প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব এবং সাত্ত্বিক পুরাণ, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮
২. গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যাতত্ত্বকৌমুদী, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬
৩. চক্রবর্তী, সুধীন্দ্র চন্দ্র, সাংখ্যা কলিকা, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১১
৪. চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ, সমগ্র সাংখ্যা সমীক্ষা(প্রাচীনতা, আধুনিকতা ও উপযোগিতা), কলকাতা : অভিযান পাবলিশার্স, ২০২০
৫. দাশগুপ্ত, সজ্ঘমিত্রা, সাংখ্যদর্শনের মূলসমস্যা, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০২১
৬. পাল, রজত, সাংখ্য, উপনিষদ ও চর্যাপদ, কলকাতা : লালমাটি, ২০২২
৭. ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, সাংখ্যদর্শনের বিবরণ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৮
৮. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অমিত, সাংখ্যদর্শন, কলকাতা : সদেশ, ২০০৯
৯. ভাবঘনানন্দ, স্বামী, সাংখ্যাকারিকা, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০
১০. মণ্ডল, নীলিমা ভারতীয় দর্শন পরিচয়, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১১
১১. শাস্ত্রী, ডঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ, সাংখ্যাদর্শনরহস্য, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১০
১২. শাস্ত্রিণা, শ্রী যদুপতি ত্রিপাঠি, যুক্তিদীপিকা, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১১
১৩. সান্যাল, জগদীশ্বর, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৮৭